কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়

ফারিহা হোসেন

| ঢাকা , বুধবার, ২৩ জানুয়ারী ২০১৯

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। এটা যেমন সত্যি তেমনি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্তি হয়েছে প্রযুক্তি। অর্থাৎ কাগুজে বইর সঙ্গে প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বে শিক্ষায় অভূত পূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। একই সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে এখন কর্মমুখী তথা প্রযুক্তিনির্ভর অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে। একটি দেশকে প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরি শিক্ষা ছাড়া সমৃদ্ধির পথে, উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। এই বিবেচনায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও অনেক দূরে রয়েছেন। তবে আশার কথা হচ্ছে বর্তমানে শেখ হাসিনার সরকার প্রযুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষায় নতুন প্রজš্ঞ গড়ে তুলতে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের সুফল পেতে আরও বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়ার আছে। একই সঙ্গে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। এটি অস্বীকার করার যো নেই যে, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষার আলোয় আলোকিত ব্যক্তি এবং জাতি সবসময় উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষে অবস্থান করে। উন্নত বিশ্বে এ ভাবেই

নিজেদের সমৃদ্ধি, উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছে। বিশ্বের দেশে দেশে শিক্ষিত শ্রেণীই রাষ্ট্র পরিচালনায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়নসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে নেতৃত্বও দেন তারা। কিন্তু শিক্ষা তখনই যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করতে সমর্থ হবে যখন তা হবে উপযুক্ত মানসম্পন্ন। শুধু মানসম্পন্ন আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাই পারে যোগ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি করতে। আর এ জন্যই শিক্ষার মানোন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্বাধীনতার ৪৮ বছরে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে এবং শিক্ষকদের সংখ্যা বেড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা গ্রহণে নানা পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এসব শিক্ষা এখনও কর্মমুখী, কর্ম উপযোগী হতে পারেনি। সরকারি নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে কেবল কেতাবী এবং পুঁথিগত। পাশাপাশি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং মান নিয়ে মানুষের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। কাজেই শুধু কাগুজে বা পুঁথিগত বিদ্যা নয় এখন জরুরি বিষয় হচ্ছে কারিগরি, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা। একই সঙ্গে শিক্ষায় ব্যয়হ্রাস মান বৃদ্ধি আবশ্যক। কারণ যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জ্ঞান অন্বেষণের সঙ্গে মানের হ্রাস-বৃদ্ধি যেহেতু জড়িত, তাই জ্ঞানের বিকাশ ও উৎকর্ষের সঙ্গে শিক্ষার মানেও পরিবর্তন আনা জরুরি। যুগোপযোগী শিক্ষার বিষয়টি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্পকলা-মানবিক-দর্শন

বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত। এর সঙ্গে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের মানদ- যাচাই হতে পারে তার মূল্যায়ন দিয়ে, যা নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি মারাত্মক ক্ষতিকর দিক হলো, কিছু কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষ পয়সার লোভে কিন্ডারগার্ডেন, প্রাক-প্রাথমিক কেজি, নার্সারি, ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম প্রভৃতি কারণে শিক্ষায় বিভাজন, বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এসব স্কুলে প্লে-গরুপ, নার্সারি, কেজি ওয়ান, কেজি টু ইত্যাদি নামে দুই থেকে চারটি পর্যন্ত প্রি-প্রাইমারি ক্লাশ চালু করে খুবই ছোট ছোট শিশুদের জীবন ধ্বংস করে চলছে। এসব ক্লাশের কচি বাচ্চাদের ওপর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ক্লাশের পড়া তৈরি ও পরীক্ষার প্রস্তুতির নামে মায়েরা এবং প্রাইভেট টিউটররা নির্মম মানসিক অত্যাচার করে চলছেন। আগের দিনে বাচ্চারা পাঁচ-ছয় বছর বয়সে স্কুলে গিয়ে ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হতো। আমাদের দেশে শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও এখন বেসরকারি প্রি-প্রাইমারি শিক্ষার জোয়ার এসেছে। নানা প্রকার ইংলিশ ও বাংলা মিডিয়ামের নার্সারি, প্রি-ক্যাডেট স্কুল, চাইল্ড কেয়ার হোম, কেজি স্কুল ইত্যাদি ব্যাঙের ছাতার মতো যেখানে-সেখানে গজিয়ে উঠেছে। এসব স্কুলে অযৌক্তিকভাবে আকাশচুম্বী ফি আদায় করে। এটা অস্বীকার করার যো নেই যে, শিশুদের শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে অনভিজ্ঞ, আনাড়ি শিক্ষক নিয়োগ করায় শিশুর ভিত্তি তৈরি হচ্ছে নড়ে বড়ে ভাবে। দালান

ত্রুটিযুক্ত হলে তা ভেঙে পুনর্নির্মাণ করা যায়। কিন্তু ত্রুটিযুক্ত দেহ-মন-আত্মা নিয়ে বেড়ে উঠা শিশুকে সংশোধণ করা মোটেও সহজ নয়। এ আত্মঘাতী ব্যবস্থার ফল আমাদের সমাজ ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছে। 'শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ' সক্রেটিসের এ বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটে, একটি দেশ কতটুকু উন্নত হবে অথবা তার ভবিষ্যৎ কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে তা নির্ভর করে সেই জাতির শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার ওপর।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ জননেত্রী শেখ হাসিনার বিশাল সাফল্য। এখন সংশ্লিষ্ট মহলের দায়িত্ব হলো এ নীতির বাস্তবায়ন করা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি সমস্যা হলো, পাবলিক পরীক্ষা বাড়ছে। অথচ দুনিয়ার সব দেশে পাবলিক পরীক্ষা কমানো হচ্ছে। অন্যান্য দেশে যিনি পড়াবেন তিনিই পরীক্ষা নেবেন এটাই হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতি। আমাদের দেশে আগে দুটো পাবলিক পরীক্ষা ছিল। এখন হয়েছে চারটি। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ একে সমর্থন করবেন না।

একজন শিক্ষকের সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই সুশৃঙ্খল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে ওই শ্রেণীর কার্যক্রম। শিক্ষক তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, ব্যক্তিত্ব, মেধা-যোগ্যতা, মননশীলতা আর আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। একজন শিক্ষককে হতে হবে দৃঢ়চেতা, উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, নিরপেক্ষ, অকুতোভয়, সত্যবাদী। তিনি তার

অনুপম চারিত্র মাধুর্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মন জয় করবেন। এক কথায় তিনি হবেন তার নিজস্ব স্বকীয়তায় অভিনেতা-শিক্ষক, শিক্ষার্থীর নিকট এক অনুস্মরণীয় আদর্শ। শিক্ষক সমাজে রয়েছে বিভাজন, যেমন সরকারি শিক্ষক, বেসরকারি শিক্ষক, এমপিওভুক্ত শিক্ষক, নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক প্রভৃতি। এ বিভাজনের মূলে রয়েছে বেতনের বৈষম্য ও প্রাসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অভাব। বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সঙ্গেও শিক্ষকদের সাধারণ বৈষম্য বিদ্যমান। বেতনের বাইরে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে পরিবহন, আবাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত। এগুলোর সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

অপরিকল্পিতভাবে স্কুলভবন বিন্যস্ত করা হয়। নতুন ভবন নির্মাণের সময় ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার জন্য খোলা জায়গার ব্যবস্থা সংকুচিত হচ্ছে। পুরনো ভবন ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণ করলে জায়গার সংকট অনেকাংশেই কম হতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ পর্যায়ে মনিটরিং সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করা যায়। পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার জন্য পরিবারের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। বরং পারিবারিক আবহাওয়ায় একজন শিশু যা শিখতে পারে না, তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শেখাতে পারে।

তবে এটা সত্যি যে, আগের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষার সব স্তরে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা

যেভাবে বেড়েছে, তাতে আয়ের ঘাটতি পূরণে ছাত্র পড়ানোর যুক্তির সপক্ষে দাঁড়ানো যায় না। অন্যদিকে তারা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দু-চারজন ছাত্রকে প্রাইভেট টিউশনি' করান না। এখন যা করেন তাকে বলা হচ্ছে 'কোচিং ব্যবসা'। নামিদামি ডাক্তারদের মতো তারাও বাড়ি ভাড়া নিয়ে দিন-রাত এমনভাবে পড়ান, যাতে পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থী ৫+ পায় (আগে ছিল স্টার মার্কস)। রাস্তার ধারে 'অমুক স্যার, তমুক স্যার' নামে বিজ্ঞাপনের বোর্ড ঝুলতে দেখা যায় শহরের বিভিন্ন স্থানে। বর্তমান সময়ে শিক্ষার অবনতির ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানচর্চার প্রতি নিবিষ্ট নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এখনকার ছাত্ররা যতটা বেপরোয়া এবং উন্নত জীবনযাপনের ধান্ধায় শিক্ষকরাও ততটা বৈষয়িক হয়ে উঠেছে। এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। অবনতি হচ্ছে নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধে। এসব কারণে বর্তমান সময়ে ছাত্ররা রজনৈতিক দলগুলো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে হয় ক্ষমতায় যাওয়া নতুবা ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে। কিন্তু এটা আসলে পরিণামে দেশ জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। এতে শিক্ষার মানের ঘটেছে চরম অবনতি। আজকাল জ্ঞানের থেকে ডিগ্রি অর্জনের দিকে অনেকের দৃষ্টি। তাই লেখাপড়ায় ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ অনেকটা কমে আসছে। কোনোরকম একটা সার্টিফিকেট সর্বস্ব ডিগ্রি অর্জনের জন্য। আর তখনই ঘটে বিপর্যয়

এবং বিপাত্ত। এ কারণ অবৈধ উপায় অবলম্বন করছে।

সহজে পাশ করার লোভে অনেকেই ছুটে চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা কোচিং সেন্টারের দিকে। কম্ম পড়ে সহজে পাস করার জন্য অনেক শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই পরিহার করে ঝুঁকে পড়ছে নোট-গাইডের প্রতি। এসব সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের হালনাগাদ প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, কোচিং ও গাইড বই বন্ধ করা।

পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে। পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। গরিব শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য বৃত্তির সুবিধা মেধার ভিত্তিতে দিতে হবে। শিক্ষার উন্নয়নে সময় উপযোগী, কর্মমুখী, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষা প্রচলন করতে হবে। শিক্ষা খাতের দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদপেক্ষ নিতে হবে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যাতে শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট না করে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও দলীয় লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে হবে। নারী শিক্ষার উন্নয়নে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক করে গড়ে তুলতে হবে। এসব কিছু করা গেলে হয়তো শিক্ষা কর্মমুখী, জীবনমুখী হবে। এই বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবেন শিক্ষার দৈন্যতা, বাণিজ্যিককরণ ঠেকাতে।

[লেখক : কলাম লেখক ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক]